তারিখ 04 SEP 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

012

দৈনিক বাংলা

সাক্ষরতার সংকট

হোসনে আরা শাহেদ

পৃথিবীর মানুষ একদিন শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, নিরক্ষরতার অন্ধকার দুঃস্বপ্নের মতো দূর হয়ে যাবে—এই আশা ও অঙ্গীকারে সাক্ষরতা দিবসের জন্ম হয়েছে। এর সূচনা ১৯৬১ সালের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে। নিরক্ষরতার পরিণামকে গভীরভাবে অনুধাবন করে গুরুত্ব দেয়া হয় নিরক্ষরতা বিদূরীকরণের প্রস্তাবকে। একে বিশ্বব্যাপী কর্মসূচী হিসাবে নেয়ার প্রস্তাবনা প্রশংসিত ও সমর্থিত হয় এবং পর্যায়ক্রমে পরের বছর অর্থাৎ বাষট্টি সাল থেকে একাধিক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পঁয়ষট্টি সালে স্থির হয় বছরের ৮ই সেপ্টেম্বর সাক্ষরতা দিবস হিসেবে উদযাপিত হবে।

সাতষট্টি সালে বিশ্ব জুড়ে প্রথম পালিত হয় সাক্ষরতা দিবস। সেই থেকে আজও চলছে এর রেশ। সাক্ষরতা দিবসের অবদান খাটো করে দেখার উপায় নেই।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, 'পরিবেশ' সবার ওপরে তার ছাপ ফেলবেই। একুশে ফেব্রুয়ারীর দেশে আটই সেপ্টেম্বর কী করে আর নতুন ভূমিকা পালন করবে? কোন মুখে এ বিশ্বস্তভাবে ধারাবাহিক অগ্রগতির প্রয়াসের প্রমাণ দেবে?

কথাগুলো ভাবতে দুঃখ লাগে বলতে তো অবশ্যই। যে উদ্যম নিয়ে উদ্যোগ শুরু হয়, তা কেন এমন হতাশায় নিমজ্জিত হয়? বায়ান্নর রক্তে একুশের জন্ম, একুশের জন্মে জন্ম মাতৃভাষার গৌরবের। ফেব্রুয়ারীর বিদায়ে এসব বচন, প্রেম বজ্রমুষ্ঠি হিমাগারে স্থান পায়। এভাবে একুশে ফেব্রুয়ারীর ফেব্রুয়ারী আসে আর বিদায় নেয়।

একই কথা আটই সেপ্টেম্বরের ক্ষেত্রেও। নিরক্ষরতা দূরীকরণ তথা সাক্ষরতা প্রসারের কর্মসূচী সিসেবে আমাদের বাস্তব অবদান কি? শিল্প শিক্ষা? বয়স্ক শিক্ষা? নৈশ বিদ্যালয়? ছাত্রসমাজের ওপর ছুটিছাটায় দায়িত্ব অর্পণ? কোন কাজটি গুরুত্ব দিয়ে নিষ্ঠা সহকারে করা হয়েছে—তার হিসাব প্রয়োজন।

সাক্ষরতা দিবস-এর শুরুর দিকে যেটুকু চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল শিক্ষার্থীদের মধ্যে। অস্বীকার করার জো নেই. আজ তা থিতিয়ে এসেছে। প্রথম প্রথম শিক্ষার স্বপক্ষে শ্লোগান তৈরি করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দেয়ালে দেয়ালে লাগানো হতো। সে ছবি পত্রিকার পাতায় এসেছেও কয়েক বছর। এক পর্যায়ে স্কুল বা কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অক্ষর-জ্ঞান দান করছে ছাত্রছাত্রীরা। এরপর এলাকায় এলাকায় নৈশ বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে।

আনন্দিত চিত্তে দেখেছি, আমাদের তরুণেরা প্রতিষ্ঠান-বন্ধের অবকাশে ছুটেছেন গাঁয়ে—প্রচার করছেন শিক্ষার মহিমা, জোগাড় করছেন টুল বেঞ্চ দায়িত্ব নিচ্ছেন শিক্ষাদানের।

এ সচেতনতাই আনবে সক্রিয়তা। সচেতনতা ও সক্রিয়তা—এ দুটো আবার পারস্পরিকভাবে জড়িত। একের অভাবে অন্যটির ঘটে অন্তর্ধান। স্বাক্ষরতা দিবস এ দেশের মাটিতে সজীব ও সফল যে কেন হল না, এ থেকেই তার আঁচ পাওয়া যায়।

আমরা দিনটিকে গ্রহণ করেছি যথারীতি আবেগে। এই আবেগের সঙ্গে যে অধ্যবসায় দরকার ছিল। ওটি পারিবিন ধরে রাখতে। পারার অবস্থাও নয়। পুরো বিষয়টিই এমন—ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হলেও সমষ্টির সংঘবদ্ধতা অত্যাবশ্যক।

প্রচার মাধ্যমেও দেখা গেছে শিক্ষা বঞ্চিতদের নিয়ে ক্লাস করার অনুষ্ঠান।

প্রারম্ভিক সেই দিনগুলোতে সাক্ষরতা দিবসের ওপর সেমিনার সিম্পোজিয়াম প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইদানীং নৈশ বিদ্যালয়গুলো অধিকাংশই অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। শিক্ষার্থীরা বয়স্ক শিক্ষা দানে নিরুৎসাহ বোধ করছে।

সাক্ষরতা এখন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। কেবল সেপ্টেম্বরের নির্দিষ্ট তারখটি এলে কিছুটা বুদবুদ ওঠে।

তবে প্রত্যেক কর্মসূচীর যেমন ঠিক তেমনি 'স্বাক্ষরতা দিবসের'ও দুটো দিক—একটি ভাবগত আরেকটি প্রায়োগিক। ভাব বা ভাবনার দিকের মতো সফলতা সবই তার সুষ্ঠু প্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল। প্রস্তাব তখনি বাস্তব হতে পারে যখন তা কাজে রূপ দেয়া হয়। বলা চলে এই রূপ দানই হচ্ছে কর্মসূচীর প্রাণ। এই জায়গায় ব্যর্থ হলে পরিকল্পনা যতোই সর্বাঙ্গপূর্ণ হোক—নিষ্ফল হতে বাধ্য।

হয়েছেও তাই। আন্তর্জাতিক ভাবে পালনের জন্য যে দিন বা দিবস তার প্রধান লক্ষ্য বিশ্ববাসীকে সচেতন করা। উদ্দেশ্য;

যদিও পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশেও শিক্ষার বেপথু অবস্থা (জাতিসংঘের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানেই এ তথ্য পাওয়া- তবু আমাদের জন্য বিব্রতকর সমস্যা মূলত দুটো ক্রমবর্ধিত জনসংখ্যা এবং ক্রমবর্ধমান দারিদ্র। এই বৃদ্ধির সঙ্গে পাশাপাশি কমছে শিক্ষা ও শিক্ষিতের হার। চুয়াত্তর সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে দশ বছরের বেশি নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল চার কোটি আশি লক্ষ। সর্বমোট জনসংখ্যার মধ্যে সাক্ষরের হার ২২ দশমিক ২ শতাংশ। ১৯৬১ সালে এ হার ছিল ২১ দশমিক ৫ শতাংশ। একষট্টি থেকে চুয়াত্তর পর্যন্ত তের বছরে সাক্ষরতা বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ। শিক্ষার হার প্রত্যাশিত পথে এগুচ্ছে না বলা যায়। লক্ষ্যণীয় আজকের সাক্ষরতা মানে কিন্তু মাত্রই সই করার জ্ঞান নয়—আজ এর ব্যঞ্জনার সম্প্রসারণ ঘটেছে। যেমন আজ প্রয়োজন ন্যূনতম লেখা, পড়া ও হিসেব-জ্ঞান। অর্থাৎ থ্রি-আর।

সাক্ষরতার সংজ্ঞা বা ব্যঞ্জনা প্রসারণ সংকোচন আমাদের সমস্যা নয়। পট, পরিবেশ পরিস্থিতি ক্রম পরিবর্তনশীল। আজকের যুগ বিজ্ঞানের। মহাশূন্যে বিজয়ীর বিশ্বের একটি অংশের মানুষ পড়ালেখার ক্ষমতা পর্যন্ত পায়নি, এ চিন্তাও কষ্টের।

শিক্ষা ছাড়া জীবন পঙ্গু। চোখ থেকেও, নেই—বিশাল অন্ধত্বে পৃথিবীর বিপুল বৈচিত্র্যে অবগাহন অসম্ভব। অথচ তবু তা এখানে বাস্তব। আমাদের দেশে গরিষ্ঠ অংশ শিক্ষা বঞ্চিত। স্বল্প মেয়াদী, দীর্ঘমেয়াদী কোনও শিক্ষা কর্মসূচীই সফলতার দাবী করতে পারলো না। নারী পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ—শিক্ষা ছাড়া জীবনের মানুষেরা শিক্ষার সংস্পর্শে আনতে পারলো না।

এই বিফলতার দায় সকলের। এখানে যা প্রবলভাবে বিরাজমান, তা হচ্ছে বৈরিতা। চিন্তার ক্ষেত্রেও দীনতা অর্থাৎ সামগ্রিকতাবোধ ও সমন্বয়ের অভাব। শিক্ষার আদর্শও ত্রুটিপূর্ণ। শিক্ষিতের ও অশিক্ষিতের মধ্যে ব্যবধান বাড়ছে। ব্যাধিমুক্ত শিক্ষা নীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার কল্যাণে আমরা শিক্ষার দ্বারাই সিঁড়ি তৈরি করছি—সমতা নয়। শিক্ষিত বেকার, অভিভাবকের মহাআতংক। সর্বস্ব বিক্রি করে মহামূল্যে শিক্ষা দিয়ে শিক্ষিত ছেলে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না—বিত্তহীন বাবা-মা এ কারণে শিক্ষাকে বিলাসিতা, ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছেন না। শিক্ষা সমস্যা সৃষ্টি করছে চক্রাকারে ভর্তি, পরীক্ষা, চাকরি সবই অনিশ্চয়তার গহ্বরে। এমন অবস্থায় কি করে তাদেরকে শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্বে প্রলুব্ধ করা যায়।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বস্তি, সমৃদ্ধি ও শ্রী শিক্ষার জন্য, শিক্ষা লাভের জন্য আকর্ষণ সৃষ্টির বড় উপাদান হতে পারে অথচ এ ক্ষেত্রেই এখানে বিপরীত ছবি। তার সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সহৃদয়তা দিয়ে একজন শিক্ষিত আরও দশজনকে শিক্ষিত করে তোলার পরিবেশ রচনা করতে পারেন, সেখানেও উল্টো কাহিনী। শিক্ষা বাস্তব বর্জিত শিকেয় তুলে রাখা অলীক পদার্থ নয়। নয় সিন্দুকে গচ্ছিত রাখা অসার সম্পদ বিশেষ. এর সঙ্গে বন্ধন জীবনের, গ্রন্থন জীবনবোধের ও জীবনদর্শের। এই দর্শনকে উজ্জীবিত করা সম্ভব হলেই শিক্ষা লাভের প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওঠা সহজ হতে পারে। আটই সেপ্টেম্বর তখন যেতে পারে প্রকৃত অর্থেই শিক্ষার সপক্ষে।